

❏ শির্ক কী ও কেন?

বিভাগ/অধ্যায়ঃ প্রথম পরিচ্ছেদ

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ড. মুহাম্মদ মুযাম্মিল আলী

আল্লাহ তা‘আলা এককভাবে মানুষের ভাগ্যের যাবতীয় কল্যাণ ও অকল্যাণের* মালিক ও পরিচালক

মহান আল্লাহ মানব জাতির জীবনকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টিরও পঞ্চাশ হাজার বছর[1] পূর্বে তাদের তাকদীর লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। এ পৃথিবীতে মানুষের জীবন যাতে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয় সে জন্য প্রত্যেকের তাকদীর লেখার পূর্বে তিনি দু’টি বিষয় নিশ্চিত করেছেন :

এক. তাদের প্রত্যেকেই যাতে এখানে পরস্পরের মুখাপেক্ষী, সহায়ক ও পরিপূরক হয়, সে জন্য তিনি তাদের জীবিকা বন্টনের ক্ষেত্রে তারতম্য করেছেন। কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তা‘আলা এ প্রসঙ্গে বলেছেন,

﴿نَحْنُ قَسَمْنَا بِيَدِهِمْ مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ مِنْهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَصَاً سُخْرِيًّا﴾ [الزخرف: ٣٢]

“আমি তাদের মধ্যে তাদের জীবিকা বন্টন করেছি, পার্থিব জীবনে যাতে তারা একে অপরকে সেবক রূপে গ্রহণ করতে পারে, সে জন্যে তাদের একের মর্যাদাকে অন্যের উপর উন্নীত করেছি।”[2]

দুই. তাদের ঈমান ও ধৈর্যের পরীক্ষা করার জন্য তিনি তাদের জীবন ও জীবিকায় নানা ধরনের অসুবিধা সৃষ্টি করার পরিকল্পনা করেছেন। এ প্রসঙ্গে বলেছেন,

﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْآخُوفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ﴾ [البقرة: ١٥٥]

“আমি অবশ্যই তোমাদেরকে ভয়, ক্ষুধা, সম্পদ, জীবন ও ফসল নষ্ট করে পরীক্ষা করবো, আর তুমি ধৈর্যশীলদেরকে সুসংবাদ দান করো।”[3]

এ দু’টি বিষয় নিশ্চিত করে তিনি মানুষের তাকদীর পরিচালনার যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন, সে পরিকল্পনাই এখন সকলের ভাগ্যে ধীরে ধীরে বাস্তবায়িত হয়ে চলেছে। শরী‘আতের নির্দেশ হচ্ছে- জীবন চলার পথে প্রত্যেকের নসীবে ভাল বা মন্দ যা-ই হাজির হবে, সেটিকে সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নিতে হবে; কেননা তা মেনে নেয়া ব্যতীত কেউই সঠিক মু‘মিন হতে পারবে না।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

«لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُؤْمِنَ بِأَرْبَعٍ : يَشْهَدُ أَنَّ لَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ بِعَئْنِي بِالْحَقِّ، وَ يُؤْمِنُ بِالْمَوْتِ وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَيُؤْمِنُ بِالْقَدَرِ»

“চারটি বিষয়ে ঈমান না আনা পর্যন্ত কোনো বান্দাই মু‘মিন হতে পারবে না: এ কথার সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো সঠিক ইলাহ নেই, আরো সাক্ষ্য দেবে যে, আমি আল্লাহর রাসূল, আমাকে তিনি সত্য দিয়ে প্রেরণ করেছেন, মৃত্যু ও তৎপরবর্তী পুনরুজ্জীবনের প্রতি ঈমান আনবে এবং তাকদীরের প্রতি বিশ্বাস করবে।”[4]

তাকদীরের প্রতি ঈমানের ব্যাপারে মু'মিনদের কর্তব্য হচ্ছে :

১. যার কাছে ভাল-মন্দ যা-ই আসে তাকে তা হাসি মুখে বরণ করে নিতে হবে। জীবন চলার পথে কখনও কোনো অমঙ্গলের শিকার হলে কোনো প্রকার বিরক্তি ও অসন্তুষ্টি প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকতে হবে।
২. অসুস্থ জীবন আর মন্দ জীবিকা পেয়ে থাকলে আপাতত ধৈর্যের সাথে তা নিয়েই সন্তুষ্ট থেকে বৈধ উপায় অবলম্বনের মাধ্যমে পরবর্তী সুস্থ জীবন ও উত্তম জীবিকা লাভের জন্য সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করতে হবে।
৩. কোনো পীর, ফকীর বা কোনো অলি অলৌকিকভাবে কোনো ভাল চাকুরী, ব্যবসায়ে উন্নতি, অসুখ থেকে মুক্তি, সন্তান দান ও নির্বাচনে জয়ী ...ইত্যাদির ব্যবস্থা করে দিতে সক্ষম মনে করে তাদের মাযারে না গিয়ে ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজনীয় উপযুক্ত করণীয় নিজেই বা অপর কোনো জীবিত মানুষের স্বাভাবিক সহযোগিতার মাধ্যমে করে নিয়ে কর্মের ফলাফল প্রাপ্তির জন্য আল্লাহর অনুগ্রহ কামনা করতে হবে এবং তাঁরই উপর পূর্ণ ভরসা করতে হবে।
৪. একমাত্র আল্লাহকেই সুস্থতা ও অসুস্থতা দানের মালিক মনে করে, সুস্থতা লাভের জন্য কোনো পীর, ফকীর বা মাযারের অলির নিকট আবেদন করা থেকে বিরত থাকতে হবে। কোনো মাযারের মাটি ও পুড়ানো মোম, মাযারস্থ পুকুর কিংবা কূপের পানি, মাছ, কুমির ও কচ্ছপ এবং মাযার সংলগ্ন গাছের শিকড়, পাতা ও ফল বা মাযারে রক্ষিত পাথর ইত্যাদিকে যে কোনো রোগের জন্য উপকারী মহৌষধ মনে না করে জনসমাজে পরিচিত সাধারণ কোনো ঔষধি গাছ অথবা কোনো ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী সাধ্যমত ঔষধ সেবন করে রোগ নিরাময়ের জন্য কেবল আল্লাহর কাছেই তাঁর রহমত কামনা করতে হবে। রোগ নিরাময়ের জন্য ঔষধের উপর ভরসা না করে কেবল আল্লাহর উপরেই ভরসা করতে হবে।
৫. স্বামী-স্ত্রী উভয়ের সন্তান প্রজনন ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও কারো সন্তান না হলে কোনো পীর, ফকীর কিংবা কোনো অলিকে অলৌকিকভাবে সন্তানের ব্যবস্থা করে দিতে সক্ষম মনে করে তাদের দরবারে না গিয়ে ধৈর্যের সাথে স্বাভাবিক প্রক্রিয়া চালিয়ে যাওয়ার মাধ্যমেই সন্তান লাভের জন্য কেবল আল্লাহর নিকটেই চাইতে হবে; কেননা সন্তান দানের একচ্ছত্র মালিক হলেন তিনিই। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন :

﴿لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ ضَرِحٌ ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذَّكَورَ ۚ ٤٩ أَوْ يَزْوِجُهُمْ ۚ ذَكَرْنَا وَإِنثًا ۚ وَبَجَعْلٍ مِّن يَشَاءُ عَقِيمًا ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ۚ ٥٠﴾ [الشورى: ৪৯, ৫০]

“সমগ্র আকাশ ও পৃথিবীর রাজত্ব আল্লাহর, তিনি যা ইচ্ছা তা সৃষ্টি করেন, যাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান এবং যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দান করেন, অথবা তাদেরকে পুত্র কন্যা উভয়ই দান করেন। আবার যাকে ইচ্ছা বন্ধ্যা করেন। নিশ্চয় তিনি সর্বজ্ঞ, ক্ষমতাশীল।”[5] সন্তান দানের মালিক যখন তিনিই, তখন তিনি যাকে তা বিলম্বে দানের ইচ্ছা করেছেন তাকে কেউ তা আগে এনে দিতে পারবে না। আর যাকে তিনি না দেওয়ার পরিকল্পনা করেছেন তাকে কেউ তা দেয়ারও ব্যবস্থা করতে পারবে না।

ঈমান ও ধৈর্যের পরীক্ষায় মু'মিনের করণীয় :

মানুষের তাকদীর সম্পর্কে আল্লাহ যখন তাদের পরস্পরকে পরস্পরের পরিপূরক হওয়া এবং তাদের ঈমানী শক্তি ও ধৈর্যের পরীক্ষা করার এ দু'টি বিষয়কে নিশ্চিত করেছেন, তখন প্রতিটি মু'মিনের করণীয় হবে- ঈমান ও ধৈর্যের

পরীক্ষায় মহান আল্লাহর উপর অবিচল আস্থা নিয়ে ঈমানের উপর মজবুতভাবে টিকে থেকে আগ্রহের সাথে অপেক্ষা করা। অন্তরে এ বিশ্বাস পোষণ করা যে, আল্লাহর কাছে তাদের অবস্থার পরিবর্তন মঞ্জুর হয়ে থাকলে বিলম্বে হলেও তাদের অবস্থা সুপ্রসন্ন হবেই। হলে তো আলহামদুলিল্লাহ, আর না হলে তারা মনে করবে যে, তাদের এ অবস্থার মধ্যেই হয়তোবা আল্লাহর দীর্ঘ মেয়াদী কোনো পরীক্ষা রয়েছে, নতুবা এ বাহ্যিক অমঙ্গলের মধ্যেই তাদের জন্য কোনো মঙ্গল নিহিত রয়েছে; কেননা সম্পূর্ণ অমঙ্গল হবে এমন কোনো কাজ করা থেকে আল্লাহ তা‘আলা সম্পূর্ণ পবিত্র। তাই অবস্থার উন্নতি না হলেও তাদেরকে আলহামদু লিল্লাহই বলতে হবে।

যারা ধৈর্য ধারণ না করে অবৈধ পন্থায় তাদের অবস্থার পরিবর্তন করতে যাবে, মনে করতে হবে যে, তারা ধৈর্যের পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়েছে। তাদের তাকদীরে আল্লাহ তা‘আলার যে ফয়সালা ছিল, তাতে তারা অসন্তুষ্ট হয়েছে। তারা অবৈধ পন্থায় তাদের অবস্থার পরিবর্তনের চেষ্টা করে আল্লাহর পরিকল্পনাকে বানচাল করে দিয়ে অসময়ে তাদের অবস্থার পরিবর্তন করতে চেয়েছে। কারো অবস্থা পরিবর্তন করার যাদের আদৌ কোনো যোগ্যতা নেই, যারা কারো মঙ্গল ও অমঙ্গলের মালিক নয় তাদেরকে তারা সব কিছুর যোগ্য ও মালিক বানিয়ে নিয়েছে। তাদেরকে আল্লাহর পরিচালনা কর্মে তাঁর পূর্ব অনুমতি ছাড়াই শাফা‘আত ও হস্তক্ষেপ করার যোগ্য বলে মনে করেছে। আরবের মুশরিকরা তাদের দেবতাদের ব্যাপারে এ ধরনের ধারণা পোষণ করেই তাদের কাছে সাহায্যের জন্য আবদার করতো।[6] তবে যেহেতু আল্লাহর পরিচালনা কর্মে এ ধরনের কোনো সাহায্যকারী ও শাফা‘আত বা মধ্যস্থতাকারীদের কোনো অস্তিত্ব স্বীকৃত নয়, সে-জন্য মহান আল্লাহ তাঁর নবীকে এ-মর্মে ঘোষণা দিতে বলেন :

﴿قُلْ أَدْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْلَ شَيْءٍ قَالَتْ ذَرْنِي فِي السَّمُوتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ ضَرِّ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شَيْءٍ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّنْ ظَهِيرٍ ۚ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ ۚ﴾ [سبا: ٢٢, ٢٣]

“আপনি বলুন, মহান আল্লাহকে ব্যতীত যাদেরকে তোমরা তোমাদের ধারণায় রব বানিয়ে নিয়েছ তাদেরকে আহ্বান কর, তারাতো আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর অণু পরিমাণ কিছুরও মালিক নয়, তাতে তাদের কোন শরীকানাও নেই, তাদের মধ্যকার কেউ আল্লাহর পরিচালনা কর্মে সাহায্যকারীও নয়, তাঁর পূর্ব অনুমতি ব্যতীত তাঁর নিকট কারো জন্যে কারো শাফা‘আতও উপকারী হয় না।”[7]

মহান আল্লাহ উক্ত আয়াতদ্বয়ে মুশরিকদের ইলাহদের যাবতীয় ক্ষমতাকে অস্বীকার করার মধ্য দিয়ে এ ঘোষণা করে দিয়েছেন যে, তিনি যে পরিকল্পনানুযায়ী এ জগতের সব কিছু পরিচালনা করছেন, তাতে অনধিকার চর্চা করার মত এ জগতে কেউ নেই। এ অস্বীকৃতির মধ্য দিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আরম্ভ করে তাঁর উম্মতের মধ্যকার সকল আউলিয়া ও দরবেশগণের উপর্যুক্ত ধরনের শাফা‘আতকেও অস্বীকার করা হয়েছে; কেননা, আরবের মুশরিকদের দেবতাদের শাফা‘আত আর আমাদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-ও অলিগণের উপর্যুক্ত ধরনের শাফা‘আতের মধ্যে কোনই পার্থক্য নেই। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, মুশরিকরা উপর্যুক্ত ধারণার পাশাপাশি অলি ও ফেরেশ্তাদের নামে তৈরী করা মূর্তি ও প্রতিমার নিকট তাদের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য শাফা‘আত কামনা করতো। আর যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অথবা আউলিয়াদের ব্যাপারে অনুরূপ ধারণা পোষণ করে, তারা তাঁদের মূর্তি না বানিয়ে এমনিতেই তাঁদের নিকট তাদের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য শাফা‘আত কামনা করছেন। মুশরিকরা যে অতীতের কোনো কোনো সৎ মানুষদের ব্যাপারে উক্ত ধারণা করে তাঁদের নামে মূর্তি তৈরী করেছিল এর প্রমাণে মহান আল্লাহ বলেন,

﴿إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِّنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَلُكُمْ ۚ فَادْعُوهُمْ ۚ فَلَيْسَ تَتَجِيبُوا لَهُمْ ۚ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

﴿ ১৭৬ [الاعراف: ১৭৬]

“আল্লাহকে ব্যতীত তোমরা যাদেরকে সাহায্যের জন্য আহ্বান করে থাকো তারাতো তোমাদের মতই বান্দা (তথা ফেরেশতা, জিন ও মানুষ)। অতএব তাঁরা তোমাদের আহ্বান শ্রবণ করেন বলে তোমরা তাঁদের ব্যপারে যে ধারণা পোষণ করে থাকো সে অনুযায়ী তাদেরকে আহ্বান কর, তারাও যেন তোমাদের আহ্বানে সাড়া দেয়, যদি তোমরা (তোমাদের ধারণায়) সত্যবাদী হও।”[৪]

এ আয়াত দ্বারা দু’টি বিষয় প্রমাণিত হয় :

এক. মুশরিকরা যে সকল মূর্তির কাছে শাফা‘আত কামনা করতো সেগুলোর কোনো কোনোটি অতীতের কোনো না কোনো সৎমানুষের নামে নির্মিত মূর্তি ছিল। যেমন- কুরআনে বর্ণিত ওয়াদ্দ, সুআ‘, ইয়াগূছ, যা‘উক ও নছর নামের সৎ মানুষদের মূর্তিসমূহ আরবের বিভিন্ন গোত্রে দেবতা হিসেবে গৃহীত ছিল বলে ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায়। এ সম্পর্কে তথ্য প্রমাণ সহ ইন-শাআল্লাহ আমরা পরবর্তীতে আরো আলোচনা করবো।

দুই. মুশরিকরা মনে করতো এ সব সৎমানুষদেরকে আহ্বান করলে তাঁরা শুনতে পারেন এবং আহ্বানে সাড়াও দিতে পারেন। তাদের এ ধারণার অবাস্তবতা প্রমাণ করার জন্য আখেরাতে আল্লাহ উপাস্য ও উপাসক উভয়কেই হাজির করে তাদের ধারণা সম্পূর্ণ অবাস্তব বলে প্রমাণ করিয়ে দেবেন।

ফুটনোট

* অকল্যাণের বিষয়টি সরাসরি আল্লাহর দিকে সম্পর্কযুক্ত করা যায় না। অকল্যাণ মানুষের নিজের কৃতকর্মের ফলেই সংঘটিত হয়ে থাকে। যদিও তাও তাকদীরে আল্লাহর পক্ষ থেকে লিখা; কিন্তু সেটাকে আল্লাহর দিকে সম্পর্কযুক্ত করা নিষেধ। রাসূলের হাদীসে এসেছে,

«وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ»

“অকল্যাণের বিষয়টি আল্লাহর দিকে সম্পর্কিত নয়”। মুসলিম, হাদীস নং ৭৭১। সুতরাং মুমিনের উচিত হবে, কল্যাণ হলে সেটাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে বলে সেটার শুকরিয়া আদায় করবে, আর যদি তার কাছে কোনো অকল্যাণ এসে যায়, তবে সেটাকে নিজের কৃতকর্মের ফল, অথবা শয়তানের কারণে, অথবা পরীক্ষা হিসেবে গ্রহণ করবে। [সম্পাদক]

[1]. ‘আমর ইবন আল-‘আস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

«إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ مَقَادِيرَ الْخَلَائِقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ»

“নিশ্চয় মহান আল্লাহ আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে সমগ্র সৃষ্টির ভাগ্য লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন।” মুসলিম, প্রাগুক্ত; কিতাবুল কদর , বাব নং ৩, ৪/২০৪৪; সুনানে আবী দাউদে কেয়ামত পর্যন্ত আগত

সকলের ভাগ্য লিপিবদ্ধ করার কথা বর্ণিত হয়েছে। দেখুন : আস্ সিজিস্তানী, সুলায়মান ইবন আশ্‌আছ, আস্ সুনান; (হিমস : সিরিয়া, সংস্করণ বিতীন, তাং বিহীন), ৫/৭৬; আত-তিরমিযী, আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবনে ঈসা, আল-জামে'উস সুনান; (মিশর: শরিকাতু মুস্তফা আল-বাবী..., ১ম সংস্করণ, ১৯৬২খ্রি.), ৪/৪১।

[2]. আল-কুরআন, সূরা আয-যুখরুফ : ৩২।

[3]. সূরা আল-বাক্বারাহ : ১৫৫।

[4]. ইমাম আহমদ, প্রাপ্ত; ১/৯৭।

[5]. আল-কুরআন, সূরা আশ-শূরা : ৪৯-৫০।

[6]. শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী, আল-ফাউযুল কাবীর; (দেওবন্দ : এমদাদিয়া কুতুবখানা, সংস্করণ বিহীন, তারিখ বিহীন), পৃ.৫।

[7]. আল-কুরআন, সূরা সাবা : ২২, ২৩।

[8]. সূরা আল-আ'রাফ : ১৯৪।

Source — <https://www.hadithbd.com/books/link/?id=12517>

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন